দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 0.1.MAR.1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

স্বাধীন বাংলাদেশে গণশিক্ষা

আবদুল্লাহ-আল-মুতী

ক'দিন আগে আমরা অমর একুশে পার হয়ে এলাম। আমাদের জাতীয় জীবনে একুশের যে কী বিশাল গুরুত্ব তা আজ আর বিশদ করে বলার প্রয়োজন নেই। আমরা সবাই জানি যে, একুশের আন্দোলন মূলত ভাষার দাবি থেকে শুরু হলেও ক্রমে ক্রমে তা জাতীয় সত্তার আত্মবিকাশ, আত্মনিয়ন্ত্রণ, স্বাধিকার ও তা থেকে এক মহান স্বাধীনতার সংগ্রামে পরিণত হয়েছে।

দীর্ঘকালের ঔপনিবেশিক শাসন এদেশের মানুষের আত্মবিকাশের সুযোগকে নানাভাবে সঙ্কুচিত করে রেখেছিল; পরাধীনতার শেকল ভেঙে এক নতুন জীবন লাভের স্বপ্ন সেদিন উদ্বেলিত করেছিল এদেশের শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর মানুষকে। তাই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কোনও ত্যাগ স্বীকারই সেদিন অসম্ভব মনে হয়নি। এই ত্যাগের মন্ত্র মূলত ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালির মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল। আজ যে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে অপেক্ষাকৃত মুক্ত পরিবেশে এক গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পথে পা বাড়াতে পেরেছি তার পেছনে একুশের শহীদের রক্ততর্পণ তাই এক অসামান্য ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে।

অমর একুশের আরেকটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবির স্বীকৃতিতে বা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলেই এ আন্দোলনের অবসান ঘটেনি। বরং আমাদের আত্মবিকাশের চেতনা প্রতিবছর অমর একুশে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে নতুন করে উজ্জীবিত হয়, সকল বাঙালির মনে তা নতুন জীবন সৃষ্টির পথে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর আমরা চার দশক পেরিয়ে এসেছি। কালের গণ্ডি পেরিয়ে দিনে দিনে এ সত্যটি আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একুশের মর্মবাণীতে একদিকে যেমন রয়েছে বাংলাভাষা, তেমনি রয়েছে এদেশের মানুষ আর তাদের আত্মবিকাশের প্রশ্ন। আমাদের আত্মবিকাশের পথে আজো তেমন প্রবল বেগ সঞ্চারিত হয়েছে একথা হয়তো কেউই বলবেন না। কিন্তু অন্তত আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি কিনা সে প্রসঙ্গটি অবশ্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। একদিকে পথটা যেমন সঠিক হওয়া প্রয়োজন তেমনি চলার বেগটাও হওয়া চাই যথার্থ; তা নইলে আমাদের প্রতিবেশী অন্যান্য দেশ ক্রমশই আমাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যেত থাকবে আর আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহের ডামাডোল আমরা বিশ্বের দরবারে কেবলই পিছিয়ে পড়তে থাকব।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

সারা পৃথিবীর মাপকাঠিতে বাংলাদেশ দেশ হিসেবে তেমন বড় নয়, তবে যথেষ্ট বড় লোকসংখ্যার বিচারে। লোকসংখ্যার মাপে বাংলাদেশের চেয়ে বড় দেশ পৃথিবীতে আজ আছে বড়জোর আটটি; এই আটটি দেশ হল চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, রাশিয়া, জাপান আর পাকিস্তান। অথচ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে বাংলাদেশ হল পৃথিবীর সবচাইতে গরীব দেশগুলির মধ্যে একটি। মাটি, পানি আর অপরূপ সুন্দর প্রকৃতি ছাড়া অন্য বস্তুসম্পদ বাংলাদেশের তেমন বেশি নেই; মানুষেরাই হল এদেশের সবচাইতে বড় সম্পদ। আর এই সম্পদকেই বিদেশী শাসকরা সবচাইতে অনুন্নত অবস্থায় রেখে দিয়েছিল। মূলত একারণেই এমন সুজলা সুফলা মাটি হওয়া সত্ত্বেও এদেশের মানুষের ভাগ্যে জুটেছে গভীর দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা। তাই বাংলাদেশকে আগামীদিনে এগোতে হলে তার মানবসম্পদ উন্নয়নের কথাই ভাবতে হবে সবার আগে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রশ্নটি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর প্রথমদিকের দিনগুলিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। সেজন্য ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম একটি পদক্ষেপ ছিল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করা। ডঃ মুহাম্মদ কুদরাত-ই-খুদার নেতৃত্বে এই কমিশন দু'বছরের মাথায় বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট নামে একটি প্রতিবেদনও দাখিল করেন। তার পরপরই দেশে যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে তার ফলে রিপোর্টটি সরকারীভাবে তেমন গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়নি। অবশ্য পাকিস্তানী শাসনামলের শিক্ষাক্রম সংস্কার করা নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়েছিল বলে ১৯৭৫ সালের শেষে একটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে সত্তরের দশকের শেষে প্রাথমিক স্তরের এবং আশির দশকের শুরুতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়। আশির দশকের গোড়ায় সরকারীভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা বিস্তারের যে উদ্যোগ নেয়া হয় তাও তেমন কোন পরিণতি লাভ করতে পারেনি। ১৯৮২-এর পট পরিবর্তনের ফলে সরকারি সাক্ষরতা কর্মসূচীটি একেবারেই পরিত্যক্ত হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাধ্যমে এদেশে মানব সম্পদের বিকাশের যে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল এভাবে তা একেবারেই স্তিমিত হয়ে আসে। শিক্ষাখাতে সম্পদ বরাদ্দও অন্যান্য খাতের তুলনায় ক্রমাগত কমতে কমতে আশির দশকে নিম্নতম পর্যায়ে নেমে আসে। এরমধ্যে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে থাকে। উন্নত-উন্নয়নশীল সকল দেশের পণ্ডিতজন এবং সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে যে, যদিও সারা পৃথিবীতে মানুষের সভ্যতা আজ বহুদূর এগিয়েছে, এ যাবৎকালের এই অগ্রগতির ধারা মোটেই সুষম নয়; আর দুনিয়া জোড়া মানুষের অগ্রযাত্রার পথে আজ প্রধান বাধা হল অশিক্ষা, মানব সম্পদের যথাযথ বিকাশের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি ঐতিহাসিক শিশু অধিকার সনদ গৃহীত হয়; তাতে অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে শিক্ষালাভ এবং ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার বলে স্বীকৃত হয়। ১৯৯০-এর শুরুতে থাইল্যান্ডের জমতিয়েন-এ অনুষ্ঠিত হয় সবার জন্য শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সেখানে সব দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানরা একটি ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন দু'হাজার সালের মধ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য বুনিয়াদি বা মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথা এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচীর পক্ষ থেকে সে বছরই প্রকাশিত হয় প্রথম মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (১৯৯০)। তাতে দুনিয়ার দেশে দেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি ঘটেছে, কোন্ কোন্ দেশ এদিক থেকে কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে তার একটা স্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হয়। তাতে বলা হয় একটি দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় কত শুধু তাই সে দেশের মানব সম্পদের মানের যথার্থ সূচক নয়। কোন দেশের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি হলেও মানুষের গড় আয়ুষ্কাল যদি কম হয়, শিশুমৃত্যুর হার বেশি হয় বা শিক্ষার হার কম হয় তাহলে সেদেশে মানুষের জীবনের মান উঁচু বলা যায় না। তাই এই প্রতিবেদনে মানুষের গড় প্রত্যাশিত আয়ু, বয়স্ক শিক্ষার হার, গড় মাথাপিছু আয় ইত্যাদি কয়েকটি পরিমাপের ভিত্তিতে একটি 'মানব উন্নয়ন সূচক' নির্ধারণ করা হয়। তারপর থেকে প্রতিবছরই ধারাবাহিকভাবে এধরনের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়ে আসছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে দুনিয়ার সব দেশের মধ্যে প্রায় একেবার পেছনের সারিতে বসে বাংলাদেশ এসব আন্তর্জাতিক উদ্যোগে উৎসাহের সঙ্গে সাড়া দেয়। অবশ্য বাংলাদেশের পক্ষে এছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না। কেননা এর পেছনে ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় থেকে সাহায্য ও সহযোগিতার প্রত্যাশা। বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমাগত অধোগতির দিকে চলেছিল; এই অধোগতিরই পরিণতিতে ১৯৯০-এর রাজনৈতিক পট/পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ দেশের জনগণের বাস্তব পরিস্থিতি এক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। ১৯৯০ সালের মানব উন্নয়নের মাপকাঠিতে বাংলাদেশের অবস্থানের ক্রম ছিল ১৩০টি দেশের মধ্যে ১০৮; ১৯৯৪ সালের তালিকায় দাঁড়ায় ১৭৩টি দেশের মধ্যে ১৪৬। সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানব উন্নয়ন সূচককে একক ধরে বাংলাদেশের সূচক ১৯৯০ সালে ছিল ০.৩১৮, ১৯৯৪ সালে হয় ০.৩০৮। অর্থাৎ নব্বই-এর দশকের শুরুতে দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ কিছু উদ্যোগ সত্ত্বেও মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান গত পাঁচ বছরে এখনও ঊর্ধ্বগামী হয়ে ওঠেনি, বরং আজো রয়েছে নিম্নগামী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই অঞ্চলের আরেকটি দেশ শ্রীলঙ্কার উচ্চ প্রত্যাশিত আয়ু (৭২ বছর, বাংলাদেশে ৫২) এবং উচ্চ বয়স্ক সাক্ষরতার হারের (৮৯%, বাংলাদেশে ৩৭%) ফলে মানব উন্নয়ন সূচক ০.৬৬৫-ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা ও চীনের ওপরে।

সবার জন্য শিক্ষা

দু'হাজার সালের মধ্যে দুনিয়া জোড়া সবার জন্য শিক্ষা প্রবর্তনের যে অঙ্গীকার জমতিয়েন সম্মেলনে ব্যক্ত হয়েছিল বাংলাদেশ তাতে সোৎসাহে স্বাক্ষর দান করে। ১৯৯০ সালে শিশু অধিকার প্রসঙ্গে নিউইয়র্কে এক শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে বাংলাদেশ সে ঘোষণাপত্রেও স্বাক্ষর করেছে। প্রধানত এই আন্তর্জাতিক বাতাবরণেই বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয় এবং তার তিন বছর পর ১৯৯৩ সাল থেকে সে আইন সারা দেশে কার্যকর হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত প্রসার ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় বেশ কিছু পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নতুন শিক্ষাক্রম ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তন, স্যাটেলাইট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, নির্বাচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাসিক গম বিতরণ এসব উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য নিরসনের লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের জন্য দশম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী চালু হয়েছে। শিশু ভর্তির জন্য ব্যাপক প্রচারণা এবং অন্যান্য পদক্ষেপের ফলে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে। এই বৃদ্ধির কিছুটা অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এমনিতেই ঘটবার কথা। তবে সরকারী হিসেবে বলা হচ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১৯৯০ আর ১৯৯৪ সালের মধ্যে প্রায় ১.২১ কোটি থেকে বেড়ে ১.৫২ কোটি হয়েছে; এই প্রবৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের প্রায় তিন গুণ। সেইসঙ্গে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের হারও শতকরা ৪৫ থেকে বেড়ে ৪৭-এ দাঁড়িয়েছে। বলা হচ্ছে সারা দেশে ৬-১০ বছর বয়সের শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ইতোমধ্যে ৮৭ শতাংশে পৌঁছেছে। অর্থাৎ ১৯৯৫ সালের জন্য ৮২% শিশু ভর্তি হারের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল প্রকৃত ভর্তিহার এর মধ্যেই তা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

যেসব কারণে ভর্তির হার বেড়েছে তার মধ্যে 'শিক্ষার জন্য খাদ্য' কর্মসূচীকে সরকারিভাবে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। তবে এযাবৎ দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র দশ শতাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গম দেয়া হচ্ছে, তাও প্রতিটি নির্বাচিত বিদ্যালয়ের ৩৩ থেকে ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে; অর্থাৎ সারা দেশের মাত্র তিন-চার শতাংশ শিক্ষার্থী এভাবে গম পাচ্ছে। এই বৈষম্যমূলক বিতরণ ব্যবস্থার ফলে যেমন একদিকে ঐসব বিদ্যালয়ে ভর্তি কিছুটা বাড়ছে তেমনি আবার নিকটবর্তী আর কিছু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা কমছে; [illegible] গম বিতরণের দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষকদের [illegible] সৃষ্টি হচ্ছে নানা জটিলতা এবং তাতে শিক্ষাদানের কাজ অনেকখানি পরিমাণে ব্যাহত হচ্ছে। এসব কারণে

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 0-1 MAR 1995 ... ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

...১৯৯৫

অনেক শিক্ষক বলছেন এধরনের খাদ্য সাহায্য বরং সব ছেলেমেয়েদের জন্য টিফিনের আকারে করা গেলে বা তাদের স্কুলের পোশাকের ব্যবস্থা করা গেলে তাতে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিতে স্থায়ী ফল পাওয়া যেতে পারত।

বাংলাদেশে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচীতে ধরা হয়েছে ১৯৯১ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ভর্তির হার ৭৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯৫ শতাংশে এবং শিক্ষার্থীদের পাঁচ বছর বিদ্যালয়ে ধরে রাখার হার ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৭০ শতাংশে উন্নীত হবে। শিক্ষার্থী সংখ্যা ইতোমধ্যে বেশ কিছুটা বাড়লেও ধরে রাখার হারে এখনও তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। কিছু কিছু নমুনা জরিপ থেকে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের খাতায় ...ত ছেলেমেয়ের নাম থাকে বাস্তবে তাদের মোটামুটি অর্ধেককে উপস্থিত পাওয়া যায়। অবশ্য ... সব ইউনিয়নে বা যে সব বিদ্যালয়ে গম ...তরণ করা হচ্ছে সেখানে এই হার স্বভাবতই ...ছুটা বেশি। সারা দেশে প্রথম থেকে পঞ্চম ...ী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা ...গতি ঘটলেও ২০০০ সালের মধ্যে ৭০ ...ংশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে কিনা তা এখনও ...শক্ত।

...ন উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দু'হাজার সালের ... সবার জন্য শিক্ষা বিস্তারের যে আন্তর্জাতিক ...কার, বাস্তব অবস্থার কারণেই তার সঙ্গে ...পুরি সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের কর্মসূচী তৈরি ...যায়নি। আন্তর্জাতিক কর্মসূচীতে বলা ...ল, ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের ...৮০ শতাংশকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা করতে হবে। সেটা করতে গেলে মৌলিক ...ণ্য প্রাথমিক শিক্ষার সীমানা অষ্টম শ্রেণী ...ড়িয়ে নিতে হয়। বাংলাদেশে ১৪ বছর ...ন্ত ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে কিছুই বলা ... শুধু ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ...আনবার কথা বলা হচ্ছে। আবার যত ...কে ভর্তি করা হচ্ছে তার বিশাল ...বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না; প্রায় ...পথেই ঝরে পড়ছে। এবং যারা শেষ ... শ্রেণীর শিক্ষা শেষ করছে তাদেরও ...প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন ...কোন নিশ্চয়তা নেই; প্রাথমিক জরিপ ...হয় যে, তাদের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ...ক্ষতা অর্জন করতে পারছে।

...লয়ে আসতে অনীহা এবং বিদ্যালয় ...ছাড়ার কারণ নিয়ে সম্প্রতি শিক্ষা ...ন গবেষণা ফাউন্ডেশন (ফ্রেপড) ও ...ভিযান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ...নমুনা জরিপ করা হয়েছে। তাতে ...এসব কারণের মধ্যে রয়েছে চরম বিদ্যালয়ের অনাকর্ষণীয় পরিবেশ, নীরস পাঠদান পদ্ধতি এবং বিশেষ ...দূর ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের দূরত্ব। ১৯৭৩-...য় সব প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি ...র পর থেকে বলতে গেলে দেশে ... সংখ্যা মোটেই বাড়েনি। তেমনি ...মিক স্তরের শিক্ষার্থী সংখ্যা প্রায় ...লে অনুপাতে মোটেই বাড়েনি ...শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা। তার ফলে গত দু'যুগে শিক্ষকপিছু শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪... থেকে প্রায় ৭০-এ, কোথাও কোথাও তারও বেশিতে দাঁড়িয়েছে।

ক্রমবর্ধিষ্ণু শিক্ষার্থী সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে শ্রেণীকক্ষ বা শিক্ষকসংখ্যা না বাড়িয়ে বিদ্যালয়ে দু'শিফট চালু করে- অর্থাৎ প্রথম দু'ঘন্টা পড়ানো হচ্ছে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী, তার পরের সাড়ে তিন ঘন্টা পড়ানো হচ্ছে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী। এই সহজ সমাধানের ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি এবং পাঠের সময় কমেছে। তার ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সঙ্গে যে সময় কাটাচ্ছে তা আশেপাশের অন্যান্য দেশের তুলনায় মাত্র অর্ধেক, চীন প্রভৃতি কোন কোন দেশের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। বিদ্যালয়ের স্বল্প পরিসরে অতি অল্প সময়ে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পড়াতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খান এবং প্রায়শ শিক্ষার নামে সেখানে যা চলে তা প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। স্বভাবতই শিশুরা এ ধরনের পরিবেশে শিক্ষা লাভে কোন আকর্ষণ বোধ করে না। বাধ্যতামূলক শিক্ষার চাবুক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাথার ওপর ঝুলিয়ে রেখেও শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা তাই দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। যেসব শিক্ষার্থী এই পরিবেশেও জ্ঞান লাভের অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে বিদ্যালয়ে টিকে থাকে তাদেরও শিক্ষার মানহয় হতদরিদ্র।

ইতোমধ্যে অবশ্য দেশে বেশ কিছু বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মাত্র ৫০,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রায় ৮৬,০০০ গ্রামের প্রয়োজন আদৌ মেটাতে পারছে না। কতকগুলি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এক্ষেত্রে উদ্যোগী হয়ে কিছু উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে তুলছেন। সেগুলোতে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত সাধারণত ৩০-এর কাছাকাছি; শিক্ষাদান পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয়। কিন্তু এ ধরনের উপানুষ্ঠানিক উদ্যোগ সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার আয়োজন করার যে সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দেশের সরকারের ওপর বর্তায় তা পুরোপুরি কাঁধে তুলে নিতে পারে না। তাই এগুলোকে কেবল একটি জরুরী সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবেই গণ্য করা যায়।

এছাড়া প্রধানত গ্রামাঞ্চলে মাদ্রাসা এবং শহরাঞ্চলে কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্নমুখী ধারার শিক্ষা পদ্ধতি চালু করে দেশের জনগণের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য বাড়িয়ে তুলছে। আমাদের সংবিধানসম্মত একমুখী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্য এতে প্রবলভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার অন্যদিকে সরকারি শিক্ষাক্রমে প্রথম শ্রেণী থেকে বিদেশী ভাষা ইংরেজি চাপিয়ে এবং অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথম শ্রেণী থেকে ধর্মীয় ভাষা আরবি প্রবর্তন করে শিক্ষার্থীদের ওপর অহেতুক ভাষার বোঝা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাতে একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে যাবার স্পৃহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করা হচ্ছে, তেমনি তাদের সৃষ্টিশীল মানসিক বিকাশকে গোড়া থেকেই পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর কাছে বিদ্যালয় আজ তাই আনন্দদায়ক জীবনচর্চার কেন্দ্র নয়, বরং এক ভীতিকর বিদ্যা গলধঃকরণের জায়গা।

শিক্ষা জীবনে ও জাতীয় জীবনে বিদেশী ভাষা এবং ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষার নিশ্চয়ই যথোপযুক্ত স্থান রয়েছে। আজকের দিনে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের বাহন হিসেবে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধেও তেমন কোন দ্বিমত নেই। তবে সকল শিক্ষাবিদ প্রাথমিক পর্যায়ের গোড়া থেকে এরকম বাধ্যতামূলক একাধিক ভাষার বোঝা চাপানোর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। বরং মাতৃভাষার দৃঢ় ভিত্তিই সকল শিক্ষার্থীকে পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ও ক্রমবর্ধমান ভান্ডারের সঙ্গে পরিচিত হতে এবং সৃষ্টিশীল সুনাগরিক রূপে গড়ে উঠতে সাহায্য করতে পারে। এদেশের কর্ণধারগণ এযাবৎ এসব যুক্তিতে কর্ণপাত করছেন না এবং জনগণের আত্মবিকাশের এই প্রতিবন্ধকটি প্রতিটি শিশুর শিক্ষা জীবনের গোড়াতেই একটি জগদ্দল পাথরের মতো আজো দাঁড়িয়ে আছে। একুশের শহীদরা মাতৃভাষার চর্চাকে যে মানব উন্নয়ন ও জাতীয় মুক্তির সোপান হিসেবে দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন তাই আজও কেবল স্বপ্ন হয়েই রয়েছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

আজ আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সকল দেশে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উন্নত দেশে সকল নাগরিকের প্রাথমিক বা মৌলিক শিক্ষা মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে বিদ্যালয়ের মাধ্যমে দেওয়া হয়; শুধু মৌলিক শিক্ষার অতিরিক্ত যে জীবনব্যাপী অব্যাহত শিক্ষার প্রয়োজন তার আয়োজন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা অপ্রতুল; তাই প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্কশিক্ষা, অব্যাহত শিক্ষা প্রভৃতি নানাধরনের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১৯৮৭ সাল থেকে সরকার প্রথমে গণশিক্ষা কর্মসূচি নামে এবং তারপর ১৯৯২ সালে নাম পালটে সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামে একটি কর্মসূচী চালু করেছেন। এর মাধ্যমে কিছুটা সরকারের নিজস্ব উদ্যোগে এবং কিছুটা বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নামে প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রম চালু হয়েছে। এই প্রকল্প অনুযায়ী ১৯৯২-৯৫ সময়কালের মধ্যে ৬৯টি থানার প্রায় দশ লাখ শিশু ও কিশোর-কিশোরী আর ছ'লাখ বয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি দেশে প্রায় তিনশ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি আরম্ভ করেছে। এসব সংস্থার উদ্যোগে গত দু'দশকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ শিশু-

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

৯ম পৃঃ দ্রঃ